শয়তানের জবানবন্দি

আরজ আলী মাতুব্বর

বোশেখ মাস, আকাশ পরিষ্কার, বায়ু স্তব্ধ। রাতটি ছিল অতি গরমের। বৈঠকঘরের বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি ; ঘুম আসে না গরমে। মনে হয় যেনো জাহাজে বয়লারের কাছে শুয়েছি অন্যত্র জায়গা না পেয়ে। মনটা ছোটাছুটি করছে তাপের লেজ ধরে কল্পনাজগতের নানা পথে। ভাবছি তাপ দু'প্রকার– কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক। কৃত্রিম তাপ কমানো যায়, বাড়ানো যায়, নতুবা তাপের উৎস থেকে দূরে সরে যাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক তাপের বেলায় সবসময় তা পারা যায় না। আজকের এ তাপের উৎস হচ্ছে সূর্য। যার স্থানীয় তাপমাত্র ৬০০০ হাজার ডিগ্রী (সে.) এবং দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। শোনা যায় যে, দোজখের আগুনের তাপ নাকি সে আগুনের চেয়ে ৭০ গুণ বেশী। অর্থাৎ ৪,২০,০০০ ডিগ্রী (সে.) এবং তা হবে মানুষের কাছে দূরত্বহীন। কেননা সে আগুনের ভিতরেই নাকি থাকতে হবে তাবৎ বিধর্মী বা অধার্মিক মানুষকে। তা-ও আবার দশ-বিশ বছর নয়, অনন্তকাল। মানুষের এহেন কষ্টভোগের কারণ নাকি একমাত্র শয়তান। তাই বিশ্বাসী মানুষ মাত্রেই শয়তানের উপর অত্যন্ত ক্ষ্যাপা।

শয়তান নাকি পূর্বে ছিলো 'মকরম' নামে একজন প্রথম শ্রেণীর ফেরেস্তা এবং অত্যন্ত মুছল্লি। সে নাকি এতই খোদাভক্ত ছিলো যে, জগতে এতটুকু স্থান বাকি নেই, যেখানে তার সেজদা পড়েনি। কিন্তু আল্লাহতা'লার হুকুম মোতাবেক নাকি বাবা আদমকে সেজদা না করায় তার ফেরেস্তার পদ ও মর্যাদা নষ্ট হয়। তাই সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বাবা আদম ও তার বংশাবলীকে দাগা অর্থাৎ অসৎকাজে প্ররোচনা দিয়ে নাকি দোজখী বানাচ্ছে। সামান্য পদমর্যাদা হানির' বিনিময়ে গোটা আদম জাতির অগণিত মানুষের দোজখবাসের কারণ হয়ে থাকলে শয়তান তো মানুষের সাধারণ শত্রু নয়– মহাশত্রু, পরমশত্রু, মহাপরমশত্রুই বটে। শয়তানের স্বভাব-চরিত্র, কার্যকলাপ ও বাসস্থান সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে শেষরাত্রে গরমটা কিছু কমে যাওয়ায় আরাম বোধ করতে লাগলাম এবং মনের ভাবনাগুলোও
স্তিমিত হলো। এ সময় শুনতে পেলাম, কে যেন কোমল কণ্ঠে মৃদুস্বরে আমাকে দরজা থেকে ডাকছে।

আমি দূর থেকে দেখতে পেলাম আগন্তুক আমার দরজার সামনে দাড়িঁয়ে আছেন। সে এক সৌম্য মূর্তি। পরনে সাদা পাজামা, গায়ে সাদা জুব্বা, মাথায় (লেজওয়ালা) সাদা পাগড়ী এবং বুক ভরা সাদা দাড়ি, সুঠাম সুডৌল তেজোদীপ্ত চেহারা। তাঁর চোখেমুখে প্রকাশ পাচ্ছে আনন্দ ও বুদ্ধির জ্যোতি। জীবনে এমন মানুষ কখনো দেখিনি, কোনরূপ আবেগ উৎকণ্ঠা নেই, 'নতুন স্থান' বলে নেই কোন কিছু নিরীক্ষণের প্রয়াস। এখানের পথঘাট, গাছপালা ও ঘরবাড়ি যেনো তাঁর সবই চেনা। ভাবলাম, লোকটা আলেম তো হবেনই, মুছল্লিও বটেন। কিছু দূরে থাকতে তিনি আমাকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানালেন, কাছে গেলে করমর্দন করলেন। আমি আমার বৈঠকঘরে প্রবেশ করে একখানা চেয়ার দেখিয়ে সসম্ভ্রমে তাঁকে বললাম– বসুন জনাব।

আগন্তুকটির পরিচয় জানার আগ্রহ নিয়ে আমি তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতে তিনি তা যেনো বুঝে ফেললেন এবং আমাকে বললেন, "আমার পরিচয় জানতে চান? আমার পরিচয় আপনি ভালো করেই জানেন। আর আপনি একাই নন, আমার পরিচয় সকল মানুষই জানে এবং ভালোভাবেই জানে। কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত আমাকে দেখেনি, দেখেননি আপনিও। পৃথিবীর জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সবখানে আমার অবাধ গতি। আমি সকল মানুষের সাথেই মেলামেশা করতে চাই, চাই ভালোবাসা করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার সাথে কেউ মেলামেশা করতে চায় না। আমার মাতাপিতা নেই; ছিলোও না কোনোদিন। আমি আল্লাহতা'লার নূরে তৈরী, কুদরতে সৃষ্টি, জন্মসূত্রে আমার নাম 'মকরম ফেরেস্তা', পরে 'ইবলিশ' এবং হাল নাম 'শয়তান'।"

আগন্তুকের নামটি শুনে আমি ভড়কে গেলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে, তার সাথে আমি কি কথা বলবো এবং কিভাবে বলবো। কোনো বিষয় কিছু ভাবতে সাহস হচ্ছে না। কেননা তিনি যেনো আমার মনের ভাবনাগুলোও দেখতে পাচ্ছেন। স্থির করলাম– কিছু ভাববো না, বলবো না কিছু, নীরব-নিশ্চিন্তে শুনে যাব শুধু, যা বলবার তিনিই বলুন। এখন সমস্যা হলো যে আগন্তুককে সম্মান প্রদর্শন করবো কি করবো না। তবে বেশ-ভূষায় তো সম্মানের পাত্রই বটে।

আমার মৌনভাব দেখে আগন্তুক যেনো আমার মনের কথা সমস্তই বুঝতে পারলেন এবং অনর্গল বলে যেতে লাগলেন, "যে কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে মুরব্বি বলা হয় এবং সভ্যাসভ্য তাবৎ মানুষ জাতির মধ্যেই 'মুরব্বি ব্যক্তি সম্মানের পাত্র'। মানুষের মধ্যে কারো কোনো মুরব্বি ব্যক্তির বয়সের জ্যেষ্ঠতা সচরাচর দশ-বিশ কিংবা পঞ্চাশ-ষাট বছর, কদাচিৎ একশ'। কিন্তু আপনাদের আদি পিতা আদম যখন সৃষ্ট হন, আমি তখন বেশ সেয়ানা এবং আজো বেঁচে আছি। সুতরাং বয়সের হিসাবে শুধু আপনারই নয়, আমি সমস্ত মানুষ জাতির মুরব্বি।

"আল্লাহ সর্বাগ্রে ফেরেস্তা বানিয়েছেন, পরে জ্বীন বানিয়েছেন এবং সর্বশেষে বানিয়েছেন আদমকে। ইসায়ীরা সৃষ্টিকর্তাকে 'পিতা' বলেই সম্বোধন করে থাকে। কাজেই একই ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে আদমকে আমার ভাইও বলতে পারি, তবে বয়সে কনিষ্ঠ। আপনাদের সমাজে বা মানব সমাজে কারো কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম (সেজদা) করবার রীতি আছে কি? হয়তো নেই। তা হলে আদমকে সেজদা না করে আমি নীতিবহির্ভুত কাজ করিনি, করেছি আল্লাহতা'লার আদেশ লঙ্ঘন। কিন্তু আদেশ যিনি করেছেন, তা লঙ্ঘন করার শক্তিও তিনিই দান করেছেন। জগতে কারো এমন কোনো শক্তি নেই, যার সে শক্তি দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাশক্তিকে পরাস্ত করে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে কার্যকরী করতে পারে। আল্লাহ জানতেন যে, আমি তাঁর হুকুমে আদমকে সেজদা করবো না, আদম তাঁর নিষেধ মেনে গন্ধম খাওয়া ত্যাগ করবে না এবং আদমের আওলাদরা তাঁর আদেশ-নিষেধ কেউ মানবে, কেউ মানবে না। তা না জানলে তিনি আদমকে সৃষ্টি করার পূর্বে, বিশেষত আমাকে শয়তান বানাবার পূর্বে বেহেস্ত-দোজখ নিমার্ণ করলেন কি করে, কি জন্য?

“আমি লাখো লাখো বছর আল্লাহকে সেজদা করে এসেছি, এখনো করি। আমি বেঁচে থাকতে আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করবো না, এ কথা তিনি জানেন এবং তিনি নিজেও বলেছেন, ‘আমাকে ভিন্ন অন্য কাউকে সেজদা করো না’। আল্লাহর আসনে অন্য কাউকে বসালে তাতে তাঁর গৌরব বাড়ে কি-না, তা তিনিই বোঝেন। তথাপি তিনি আদমকে সেজদা করার জন্য ফেরেস্তাদের হুকুম করার কারণ– এটা তাঁর লীলা অর্থাৎ অন্তরের বাণী নয়।

“আল্লাহ সাতটি দোজখ বানিয়েছেন, সবগুলোতে মানুষ থাকার জন্য। তিনি কি চান যে, আমি আমার দাগাকাজ বন্ধ করি, আর তাঁর দোজখগুলো খালি থাক? তা তিনি চান না, চাইতে পারেন না। চাইলে তাঁর দোজখ বানাবার সার্থকতা ক্ষুণ্ন হয়। আল্লাহর ইচ্ছা যে, কিছুসংখ্যক মানুষ দোজখবাসী হোক। আর আমাকে বলেছেন তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণে সহায়তা করতে। এ কাজ আমার পক্ষে করা ফরজ, না করা হারাম।

“আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না, কেউই পারে না। বহু চেষ্টা করেও কোনো নবী-আম্বিয়া, দরবেশকে আমি দোজখবাসী করতে পারিনি। কেননা তাঁরা দোজখবাসী হোন, তা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। পক্ষান্তরে হজরত ইব্রাহিম নমরুদকে, হযরত মুসা ফেরাউনকে এবং শেষ নবী (দ্) আবু জেহেলকে হেদায়েত করে বেহেস্তের তালিকায় নাম লেখাতে পারেননি আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও। কেননা তা আল্লাহর ইচ্ছা নয়।

“আপনারা মনে করেন যে, আল্লাহর যতো সব রহমত মানুষের উপরই বর্ষিত হয়। বস্তুত তা নয়। আল্লাহর রহমত আমার উপর অনেক বেশী মানুষের তুলনায়। আদমকে সৃষ্টি করার কতো লাখ বছর পূর্বে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তা তিনিই জানেন। অথচ আল্লার রহমতে আমি আজও বেঁচে আছি। কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকে মাত্র ৬০, ৭০ কিংবা ১০০ বছর। তদুপরি শিশুমৃত্যু-অপমৃত্যু যথেষ্ট। আমার সুদীর্ঘ জীবনে আজ পর্যন্ত আমি কোনোরূপ রোগ শোক বা অভাব ভোগ করিনি, আল্লাহর রহমতে। কিন্তু মানুষ অসংখ্য রোগ, শোক ও অভাবে জর্জরিত। ফেরেস্তারা আমাকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়েন আবহমান কাল থেকে। অথচ আল্লাহর রহমতে আমি নিরাপদেই থাকি। কিন্তু তাতে (বজ্রপাতে) ধ্বংস হয় সবকিছু, মরে মানুষ। পবিত্র মক্কায় গিয়ে হাজী সাহেবরা আবহমানকাল আমায় লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়েন। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তা আজ পর্যন্ত আমার গায়ে পড়েনি একটিও। অথচ সমুদ্রে জাহাজ ডুবে অসংখ্য হজযাত্রী মারা যান, আল্লাহর রহমতে।

“আল্লাহর রহমতে আমি নিমেষে বিশ্বভ্রমণ করতে পারি, পারি অদৃশ্যকে দেখতে, শ্রবণাতীতকে শুনতে, নিজে অদৃশ্য থেকে অন্যের মনের খবর জানতে। দু’দিন অনিদ্রা-অনাহারে থাকলে মানুষ ঝিমিয়ে-নেতিয়ে পড়ে। আর আমি লাখ লাখ বছর ধরে অনিদ্রা-অনাহারেও সুস্থ-সবল আছি, সে তো আল্লাহর রহমতেই। বলা যাবে যে, মানুষ তো ওর অনেক কিছুই আয়ত্ত করে ফেলেছে। অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, রেডিও, টেলিভিশন, রকেট ইত্যাদি যন্ত্র দিয়ে মানুষ এখন অদৃশ্যকে দেখছে, শ্রবণাতীতকে শুনছে, আকাশে-পাতালে ভ্রমণ করছে, অনাহারে বেঁচে থাকার গবেষণা চালানো হচ্ছে এবং কেউ তো অন্যের মনের ভাবও জেনে নিচ্ছে টেলিপ্যাথির সাহায্যে। এসব মানুষ আয়ত্ত করছে সত্য, হয়তো আরো

অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করবে। কিন্তু সে সমস্ত যাঁরা করছেন ও করবেন, তাঁরা তো আমারই শিষ্য।

"কোনো মানুষের অকল্যাণ আমার কাম্য নয় এবং তা করিও না। পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতে এমন কতোগুলো বিধি-নিষেধ রয়েছে, যা মানুষের অকল্যাণই করে এসেছে আবহমান কাল থেকে। তাই মানুষের কল্যাণ কামনায় সে সব বিধি-নিষেধ অমান্য করার জন্য আমি মানুষকে প্রেরণা দিচ্ছি। কেননা সে সব বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করার জন্য মানুষকে প্রেরণা দেওয়াই আমার কাজ। আর তারই ফল আধুনিক জগতে মানব জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ক্রমোন্নতি। তথাকথিত ধর্মগ্রন্থগুলোতে আকাশতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব ইত্যাদি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য যাবতীয় তত্ত্বালোচনাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, ঘোষিত হয়েছে স্বর্গ ও নরক-তত্ত্ব, বিশেষভাবে।

"মানুষ আজ সমুদ্রতলে বিচরণ করে, আকাশে পাড়ি জমায়, পরমাণুগর্ভে প্রবেশ করে এবং কতো অসাধ্য সাধন করে, কিন্তু এর কোনোটাই ধর্ম বা ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মানুষকে শিক্ষা দেয়নি, বরং নিষেধ করেছে বারে বারে। আমার কর্তব্য বিধায় ওসব আমিই শিক্ষার প্রেরণা দিয়েছি। ও দিচ্ছি মানুষকে, আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে। কিন্তু তাতে শুধু অধার্মিকরাই লাভবান হয়নি, ধার্মিকরাও ভোগ করছেন তার সুযোগ-সুবিধাগুলো পুণ্যার্জনের জন্য। জল, স্থল ও হাওয়াই যানের সাহায্য ছাড়া শুধু পদব্রজে পবিত্র হজ্জব্রত পালনে হাজীদের সংখ্যা কতোজন হতো, তা হিসেব করে দেখেছেন কি? বর্তমান ওয়াজে, আজানে, পবিত্র কোরান তেলাওয়াতে, জানাজার নামাজেও মাইক, রেডিও, টেলিভিশন ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে পুণ্যের মাত্রা নিশ্চয়ই বাড়ছে। সুতরাং শুধু পাপকর্মের দ্বারা দোজখে যাবার জন্যই নয়, পুণ্যকর্মের দ্বারা বেহেস্তে যাবার জন্যও আমি মানুষকে সহায়তা করছি না কি ? এছাড়া আমি হামেশা আল্লাহকে স্মরণ করি, তাঁর হুকুম পালন করি, তাঁর এবাদত করি, কিন্তু দোজখ থেকে পরিত্রাণ বা বেহেস্ত লাভের প্রত্যাশায় তা করি না। কেননা দোজখের শাস্তিও বেহেস্তের সুখ আমার কাছে অকেজো। যেহেতু নূরের তৈয়ারী দেহ আমার আগুনে জ্বলবে না এবং আহার-বিহার নিদ্রা ইত্যাদি না থাকায় (বেহেস্তের) সুখাদ্য ফল, সুপেয় পানীয়, স্বর্ণপুরী সুন্দরী ললনা (হুর-গেলমান) ইত্যাদি আমার কোনো কাজেই আসবে না। পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি জীবমাত্রেই আল্লাহর এবাদত করে থাকে। কিন্তু তারাও দোজখের ভয়ে বা বেহেস্তের লোভে তা করে না। অথচ মানুষ তা-ই করে থাকে। ধর্মের নিশানধারীদের মধ্যে হাজারে বা লাখে এমন একজন মানুষ মিলবে কি-না সন্দেহ, যিনি নিছক আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই পুণ্যকাজ করেন, যার সাথে বেহেস্ত-দোজখের সম্পর্ক নেই। যারা দোজখের ভয়ে বা বেহেস্তের লোভে পুণ্যকাজ করে, তারা আমার চেয়ে অধম, পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট।

"এ যুগের মানুষ আপনি, হয়তো কম্পাস দেখেছেন। ওর কাঁটার একটা প্রান্ত সর্বদা পৃথিবীর উত্তরে সুমেরুর দিকে এবং অপর প্রান্ত দক্ষিণে কুমেরুর দিকে স্থির হয়ে থাকে। কেউ ওর ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না। নাড়াচাড়া বা জোরজুলুম করে সাময়িকভাবে ওর কিছু ব্যত্যয় ঘটালেও, ছাড়া পেলে কাঁটা স্থির হয় গিয়ে সাবেক বিন্দুতে। কোনো কম্পাসের কাঁটাদ্বয়ের কোন্ প্রান্ত 'সুমেরু' ও কোন্ প্রান্ত 'কুমেরু' মুখী থাকবে, তা নির্ধারিত হয় তার

সৃষ্টিকর্তার (নির্মাতার) দ্বারা তখনই, যখনই তিনি কাঁটাটিকে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ যখন কাঁটাটিকে ধন (পজিটিভ) ও ঋণ (নেগেটিভ) ধর্মী দুটি আলাদা জাতের বিদ্যুতের দ্বারা চুম্বকায়িত করেন। কোনো সাধারণ মানুষের সাধ্য নেই কম্পাসের কাঁটার দিকপতনে ব্যত্যয় ঘটাবার, একমাত্র তার সৃষ্টিকর্তা (নির্মাতা) ছাড়া। অনুরূপভাবেই মানুষের মানসরাজ্যেরও 'সু' ও 'কু' দু'টি মেরু আছে। তবে তাকে 'মেরু' বলা হয় না, বলা হয় 'প্রবৃত্তি'। অর্থাৎ 'সুপ্রবৃত্তি' এবং 'কুপ্রবৃত্তি'। সুপ্রবৃত্তি থাকে বেহেস্তমুখী এবং কুপ্রবৃত্তি থাকে দোজখমুখী হয়ে। মানবমনের এরূপ বৃত্তিবিভাগ করেছেন আল্লাহতা'লা মানবসৃষ্টির বহু পূর্বে। যে সময়টিতে আল্লাহ এ বিভাগ দু'টি নির্ধারণ করেছেন, সে সময়টিকে বলা হয় 'রোজে আজল' বা 'নিয়তি'।

"রোজে আজল-এ নির্ধারিত ফলাফলের বিরুদ্ধে দাগা দিয়ে কোনো মানুষকে আমি দোজখী বানাতে পারি না এবং কোনো ধর্মপ্রচারকও হেদায়েত করে কোনো মানুষকে বেহেস্তবাসী করতে পারেন না। তবে সাময়িক মনের পরিবর্তন ঘটানো যায় মাত্র। কোনো কম্পাসের কাঁটাকে নেড়েচেড়ে বা জোর করে মেরুভ্রষ্ট করা হলে, ছুট পেলে পুনঃ যেমন সাবেক মেরুতে চলে যায়, মানুষের মানসকাঁটাও তদ্রূপই। সুমেরুমুখী কোনো মানুষকে দাগা দিয়ে তার দ্বারা আমি অসৎকাজ করাতে পারি, এমন কি তাকে 'কাফের' নামে আখ্যায়িত করাতেও পারি। কিন্তু পারি না তার জীবনসন্ধ্যায় তওবা পড়ে 'মোমেন' হয়ে বেহেস্তে যাওয়া রোধ করতে। অনুরূপভাবেই কুমেরুমুখী কোনো মানুষকে হেদায়েত-নছিহত করে তার দ্বারা কোনো ধর্মপ্রচারক সৎকাজ করাতে পারেন এবং তাকে আখ্যায়িত করতে পারে 'মোমেন' নামে। কিন্তু তিনি পারেন না তার অন্তিম মুহূর্তে 'বেঈমান' হয়ে দোজখে যাওয়া রোধ করতে। এভাবে অনেক 'সমাজী কাফের' বেহেস্তে যাবে। যাবে 'সমাজী মোমেন' দোজখে।

"আল্লাহ যাঁকে দোজখবাসী করতে চান না, আমি শত চেষ্টা করেও তাঁকে দোজখী বানাতে পারি না। লক্ষাধিক নবী-আম্বিয়াদের প্রত্যেককেই আমি দাগা দিতে চেষ্টা করেছি এবং কিছু কিছু সফলও হয়েছি। কিন্তু আমি কাউকে দোজখী বানাতে পারিনি।

"আমার দাগায় পড়ে তারা সামান্য গুনাহ যা করেছেন, আল্লাহ তার শাস্তি প্রদান করেছেন এ দুনিয়াতেই, পরকালে তাঁরা সবাই থেকেছেন নিষ্পাপ। যেমন– হযরত আদমের বেহেস্ত থেকে দুনিয়ায় নির্বাসন, হযরত ইউনুসের মৎস্যগর্ভে বাস, হযরত আইউবের বিমার, শেষ নবী (দ.)-এর খান্দান শহিদ ইত্যাদি উক্তরূপ পাপেরই শাস্তি।

"আজ পর্যন্ত আমি আল্লাহতা'লার মাত্র একটি হুকুমই অমান্য করেছি। তাঁর হুকুমে আদমকে সেজদা না করে। আর অন্য ক'জনও তো তাঁর হুকুম অমান্য করেছে প্রায় একই সময়, একই জায়গায় থেকে। কিন্তু সেজন্য তিনি রাগ করেননি বা কাউকে কোনোরূপ শাস্তি দেননি। জেবরাইল, মেকাইল ও এস্রাফিল ফেরেস্তাত্রয়কে আল্লাহ হুকুম করেছিলেন পৃথিবী থেকে মাটি নেবার জন্য, আদমকে বানাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু একে একে তিন ফেরেস্তাই আল্লাহর হুকুম খেলাপ করে ফিরে গেলেন তাঁর কাছে খালি হাতে, মাটির অসম্মতির জন্য। অবশেষে আজরাইল ফেরেস্তা আল্লাহর আদেশ মোতাবেক জোরপূর্বক

কিছু মাটি নেওয়ায় তদ্বারা আদমকে বানানো হলো। কিন্তু চারবার আদেশ অমান্য সত্ত্বেও আল্লাহ মাটিকে (দোজখের) আগুনে পোড়ালেন না, বরং পানি দিয়ে কাদা বানিয়ে মহানন্দে আদমের মূর্তি বানালেন ও তাতে প্রাণদান করলেন। আর তিনি ফেরেস্তা যে তাঁর হুকুম অমান্য করলেন তুচ্ছ মাটির কথা মেনে, তা যেনো তাঁর খেয়ালই হলো না। পক্ষান্তরে তাঁর হুকুম অমান্যের দায়ে আমাকে নাকি দিলেন অভিশাপ, আমার গলায় দিলেন লা'নতের তাওক এবং নির্বাসিত করলেন বেহেস্ত থেকে দুনিয়ায় চিরকালের জন্য। এসব কি তাঁর পক্ষপাতিত্ব বা ন্যায়বিরোধী কাজ নয়? না, এতে তিনি এতটুকু পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায় করেননি। বরং অন্যায় করেছে মানুষ, তাঁর ইচ্ছে ও উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে না পেরে।

"বলা হয় যে, আমি অভিশপ্ত, তিরস্কৃত ও নির্বাসিত হয়েছি। বাস্তবে তার একটিও না। এ বিষয়ে একটু খোলাসা করেই বলি।

"প্রথমত আমি আল্লাহর বিরাগভাজন ও অভিশপ্ত হয়ে থাকলে তিনি আমাকে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান করতে পারতেন, পারতেন রোগ, শোক, দুঃখ-কষ্ট ও অভাব ভোগ করাতে, যেমন করেছেন হারুৎ-মারুৎ ফেরেস্তাদ্বয়কে।
সর্বোপরি পারতেন মৃত্যু ঘটিয়ে জগত থেকে আমাকে নিশ্চিহ্ন করতে। কিন্তু তিনি তার একটিও করেননি। বরং উল্টোই করেছেন। যদি কেউ কাউকে বলে, 'তুমি রোগ, শোক, দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করো'-তাহলে সেটা কি তার পক্ষে আশীর্বাদ না অভিশাপ? আল্লাহ আমাকে কোনো রোগ দেননি, শোক দেননি, অপমৃত্যু দেননি, কোনো অভাব দেননি, বরং দীর্ঘায়ু দান করেছেন। এসবের মধ্যে অভিশাপ কোনটি?

"দ্বিতীয়ত বলা হয়ে থাকে যে, আমি তিরস্কৃত হয়েছি। অর্থাৎ আল্লাহ আমার কন্ঠে লা'নতের তাওক দান করেছেন। এ কথাটি ও পুরো ঠিক নয়। আমি 'তাওক' একটি পেয়েছি ঠিকই। তবে সেটা কাঠের না লোহার না স্বর্ণের তৈরী, কেউ তা দেখেননি বা শোনেননি কারো কাছে আজ পর্যন্ত। ওটা কারাবাসীর কন্ঠে যেমন তিরস্কার (তাওক), তেমন বিজয়ীর কন্ঠে পুরস্কার (মেডেল) সূচিত করে। তারতম্য শুধু গঠন ও উপকরণে। এ বিষয় পরে বলবো।

"তৃতীয়ত বলা হয় যে, আমি বেহেস্ত থেকে বিতাড়িত হয়েছি, নির্বাসিত হয়েছি পৃথিবীতে। আল্লাহর আদেশে পৃথিবীতে আসা-যাওয়া অথবা স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাঁর নির্দেশিত কর্তব্য তো অন্যান্য ফেরেস্তাগণও পালন করে থাকে। তারাও কি নির্বাসিত? জেবরাইল ফেরেস্তা সংবাদ বহন ও আজরাইল ফেরেস্তা মানুষের জান কবজ করার উদ্দেশ্যে না হয় পৃথিবীতে আসে ও চলে যায়। কিন্তু মিকাইল ফেরেস্তা পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারে না আবহাওয়া বিভাগের কাজ বন্ধ করে। কেরামান ও কাতেবীন ফেরেস্তাদ্বয় রোজনামচা (ডাইরী) লেখা ছেড়ে দিয়ে মানুষের কাঁধ থেকে এক পা বাইরেই দিতে পারে না এবং মনকির ও নকিরকে তো জীবন কাটাতে হচ্ছে মানুষের কবরে কবরেই পৃথিবীতে। এঁরা যদি নির্বাসিত বলে সাব্যস্ত না হন, তবে আমি নির্বাসিত হই কোন বিচারে? আমিও তো আল্লাহর আদেশে আমার কর্তব্য পালন করে যাচ্ছি পৃথিবীতে বসে। বরঞ্চ আমি ওদের প্রত্যেকের চেয়ে মুক্ত ও স্বাধীন।

"জেবরাইল ফেরেস্তা সংবাদবাহক। সে আল্লাহর সকালের আদেশ বিকেলে পৌঁছাতে পারে না। মেকাইল ফেরেস্তা আবহাওয়া পরিচালক ও খাদ্য পরিবেশক। সে আল্লাহর সকালের আদেশের

বৃষ্টি বিকেলে এবং বাংলাদেশের বৃষ্টি আরবদেশে বর্ষাতে পারে না, পারে না ধনীর খাদ্য গরীবকে দান করতে। এভাবে প্রত্যেক ফেরেস্তাই আছে তাদের নিজ নিজ কর্তব্যের নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু আমার কর্তব্য (পরীক্ষা) কাজ সম্পাদনে আল্লাহ আমাকে এরূপ কোনো নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেনি। আমার পরীক্ষাকাজের সকাল-বিকাল নেই বা শীত বসন্ত নেই, এশিয়া ইউরোপ নেই, নেই যুবা-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব পার্থক্যের নির্দেশ। বস্তুত আমি বিতাড়িত বা নির্বাসিত নই, অন্যান্য ফেরেস্তাদের মতোই আমি কর্তব্যের খাতিরে প্রেরিত হয়েছি পৃথিবীতে। আমি আল্লাহর মনোনীত ফেরেস্তা- বিশ্ববাসীর বিশ্বাসের পরীক্ষক (এক্সামিনার)।

"বলা হয় যে, আদমকে সেজদা না করায় আমি ঘৃণিত ও অধঃপতিত হয়েছি এবং আদমকে গন্ধম ভোজন করিয়ে মানুষের শত্রু হয়েছি। বাস্তবে তা নয়। বরং পুরস্কৃত হয়েছি ও পদোন্নতি লাভ করেছি এবং মানবকুলের বন্ধুর কাজই করেছি। আমার কথা শুনে আপনি একটু তাজ্জব হলেন বুঝি। এ বিষয়ে একটু বুঝিয়ে বলি।

ফেরেস্তারা নূরের তৈরী। তাই পাক-সাফ বটে, তবে ওদের বুদ্ধি নেহাত কম। নিজেরা কোনো কাজই করতে পারে না আল্লাহর হুকুম তামিল করা ছাড়া। 'হাঁ হুজুর' ছাড়া 'না হুজুর' বলার ওদের অভ্যাস নেই। তবে একদিন 'না হুজুর' বলেছিল, কিন্তু তা খাটেনি। আল্লাহ মানবজাতি সৃষ্টির পরিকল্পনা ঠিক করে আদমকে বানাবার পূর্বে ফেরেস্তাগণের আক্কেল পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। তাতে তারা আল্লাহকে বলেছিলেন, 'আদমীরা আপনার হুকুম-আহ্কাম মানবেনা বা এবাদত করবে না। সুতরাং আদম সৃষ্টি না করাই উত্তম'। মানবজাতির পরম সৌভাগ্য যে, আল্লাহর ফেরেস্তাদের সে উপদেশ অগ্রাহ্য করে আদমকে বানালেন। কিন্তু আল্লাহ যদি ফেরেস্তাদের প্রস্তাব মেনে আদমকে না বানাতেন, তাহলে মানবজাতির এ দুনিয়াপ্রীতির কি দশা হতো?

"আদমকে বানিয়ে আল্লাহ ফেরেস্তাদের ডেকে বললেন- তোমরা আদমকে সেজদা করো। আল্লাহর হুকুম পেয়ে সব ফেরেস্তা একযোগে অর্থাৎ জামাতের সহিত এক রাকাত নামাজ আদায় করলেন আদমকে কেবলা করে। কিন্তু আমি সে নামাজ পড়লাম না। আল্লাহর আসনে আদমকে বসিয়ে তাকে সেজদা করতে আমার বিবেক বাধা দিল। আমার বিবেক বললো যে, আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করো না'। তবে আজ কেন আদমকে সেজদা করতে বললেন? হয়তো এর কারণ ফেরেস্তাদের আক্কেল পরীক্ষা করা। আল্লাহ দেখতে চান যে, ওদের তুচ্ছ করা আদমকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ফেরেস্তারা সেজদা করতে আপত্তি করে কি-না।

"মনে করুন- কোনো এক ব্যক্তি তার পাঁচটি ছেলেকে ডেকে জনৈক পথিককে দেখিয়ে বললো, 'তোমরা সবাই ওকে বাবা বলে ডাকো'। পিতার আদেশ পালন করা কর্তব্য, এ নীতিবাক্যটি পালন করে চারটি ছেলেই সেই পথিককে 'বাবা' বলে ডাকলো। কিন্তু একটি ছেলে ডাকলো না। সে ভাবলো, 'পিতা কখনো দুজন হতে পারে না। পথিককে বাবা বললে তা হবে মিথ্যে কথা বলা। আর পিতা তো আগেই বলেছেন, কখনো মিথ্যে কথা বলবে না। আমার মুখে পথিককে বাবা ডাকার মধুর শব্দটি শুনে পিতা খুশী হবার জন্য নিশ্চয়ই এ কথাটি বলেননি, বলেছেন আমাদের আক্কেল পরীক্ষার জন্য। সুতরাং পিতার এই আদেশটি না মানায় শ্রেয়'। এ ভেবে সে ছেলেটি তার

জীবনের মহা কর্তব্য (সত্যকথন) পালন করলো, কপট পিতাকে মিথ্যে 'বাবা' ডাকলো না। ছেলেদের পিতা তাঁর ছেলের অজ্ঞতা দেখে মনোক্ষুণ্ন হলেন এবং এক ছেলেকে বিজ্ঞতার পুরস্কার বাবদ তার গলায় দিলেন মেডেল।

"আল্লাহ হলেন অন্তর্যামী। মানুষ বা ফেরেস্তা কারো বাহ্যিক আচার-আচরণ দেখে তিনি তুষ্ট হন না, বিচার করেন মনের। আদমকে সেজদা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ ফেরেস্তাগণের আক্কেলের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। আমি তাতে উত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি আমাকে দান করেছেন বিজয়ের একটি নিশানা। কেউ কেউ তাকে বলে আমার পরাজয়ের নিশানা বা লা'নতের তাওক। বস্তুত আল্লাহ আমাকে দান করেছেন বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ 'মেডেল'।

"বলা হয় যে, আমি আদমের শত্রু, আদম জাতির শত্রু। কেন না গন্ধম ভক্ষণ করিয়ে আমি আদমকে বেহেস্তছাড়া করেছি। আসলে তা নয়। যৌনক্রিয়ায় নাকি মানুষ নাপাক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বেহেস্ত হলো চিরপবিত্র স্থান। সেখানে ওসব নাপাকীর স্থান নেই। কাজেই আদম-হাওয়া বেহেস্তে থাকলে তাদের যৌনক্রিয়া আজীবন বন্ধ রাখতে হতো। ফলে আদম থাকতেন নিঃসন্তান ও নির্বংশ। আদমের প্রেমাশক্তি সম্পূরণ ও বংশবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ আদম-হাওয়াকে স্থান দিয়েছেন পৃথিবীতে তাদের বংশবৃদ্ধির গরজে।

"বেহেস্তের মধ্যে তখন তিন জাতীয় ফলের গাছ ছিলো। প্রথমত সুখাদ্যদায়ক বৃক্ষ, এর ফলগুলো ছিলো সাধারণ খাদ্য। অর্থাৎ জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য। দ্বিতীয়ত জীবন বৃক্ষ। এর ফলগুলো ছিলো অমরত্বের প্রতীক। অর্থাৎ পরমায়ুবর্ধক। তৃতীয়ত জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ। অর্থাৎ জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক। এই 'জ্ঞানদায়ক' ফলটিরই নামান্তর 'গন্ধম'।

"আদমকে যখন বানানো হলো, তখন তিনি ছিলেন নির্জীব মাটির পুতুল এবং আল্লাহ যখন প্রাণদান করলেন, তখন হলেন তিনি সজীব পুতুল। কিন্তু তখনও 'জ্ঞান' বস্তুটি তার মধ্যে ছিলো না মোটেই। এমন কি লজ্জা-জ্ঞানও না। আদম-হাওয়া ছিলেন উলঙ্গ। ইতর প্রাণী ও মানুষের প্রধান পার্থক্য হলো লজ্জাজ্ঞান। আদম-হাওয়ার সেই লজ্জাজ্ঞান জন্মালো গন্ধম ভক্ষণের পর। ক্রমে জন্মালো ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিবিধ জ্ঞান গন্ধম ভক্ষণের ফলে। পক্ষান্তরে বিবি হাওয়া হলেন রজস্বলা গন্ধম ছেঁড়ার ফলে। কাজেই গন্ধম না খেলে হযরত আদম থাকতেন জ্ঞানশূন্য আর বিবি হাওয়া থাকতেন বন্ধ্যা। আদমের জ্ঞান ও বিবি হাওয়ার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি জন্মালো গন্ধম খাওয়ার ফলে। সুতরাং গন্ধম খাইয়ে আমি শুধু আদম-হাওয়ারই নয়, তাবৎ মানবজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বংশবিস্তারের সহায়তাই করেছি, যা অন্য কোনো ফেরেস্তা করেননি। কার্যত আমি মানুষের পিতার চেয়ে ভক্তির পাত্র এবং গুরুর চেয়ে মান্যবর। দুঃখের বিষয় এই যে, কতক মানুষ তা বাহ্যত মানতে চান না, তবে কার্যত মেনে চলেন। আর তাতেই আমি সন্তুষ্ট। কেননা একজন বিশ্বাসী মানুষ দিনেরাতে নানা কারণে যতবার আমার নামটি মুখে উচ্চারণ করেন, মনে হয় যে, ততোবার তার বাবার নামও উচ্চারণ করেন না। বিশেষত আমার নামটি তাদের প্রাতঃস্মরণীয় ও অগ্রপাঠ্য।

"আপনি ভাবছেন, এ বিরাট পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে দাগা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় কিরূপে। আপনার এ ভাবনাটা অমূলক নয়। আসলে ও কাজটা ততো কঠিন নয় আমার পক্ষে। কেননা আমি দুনিয়ার সকল অঞ্চলের সকল মানুষকে দাগা দেই না, দাগা দেই ঈমানদারদিগকে।

অর্থাৎ যারা আমাকে বিশ্বাস করে তাদেরকে। আমার উপর যাদের ঈমান নেই, অর্থাৎ আমি 'আছি' বা আমার অস্তিত্বকে যারা অস্বীকার করেন, তারা তো কাফের। কেননা পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেছেন, 'শয়তান আছে' এবং পবিত্র হাদিছে নবী বলেছেন, 'শয়তান আছে'। এতদসত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি যদি বলে, 'শয়তান নেই', তবে পবিত্র কোরান-হাদিছের বাণী অমান্যকারী সে ব্যক্তি কি কাফের নয়?

"আবার যে ব্যক্তি কাফেরের ঔরসে জন্মলাভ করে, সে তো জন্মসূত্রেই কাফের এবং সে নানাবিধ বেসরা কাজ (মূর্তিপূজা) ইত্যাদি করে থাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমার দাগা দেওয়া ছাড়াই। তাকে তার কৃতকর্মে বাধা দানের অর্থ হয় অসৎকাজে অর্থাৎ পাপকাজে বাধাদান করা। আল্লাহ তো কারো অসৎকাজে আমাকে বাধা দিতে বলেন নি। তাই আল্লাহর আদেশ মেনেই আমি কোনো বিধর্মীকে দাগা দেই না। অর্থাৎ আমার অস্তিত্বের উপর যাদের ঈমান নেই, তাদের আমি দাগা দেই না, এমনকি তাদের কোনো সৎকাজেও না। তাইতো বর্তমান দুনিয়ায় ঈমানদারদের চেয়ে বেঈমানদারগণই সৎকাজ করেন বেশী।

"আমাকে যেমন সকল মানুষকে দাগা দিতে হয় না, তেমন সকল জায়গায় আমি সমভাবে অবস্থানও করি না। বিশ্বাসীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনা মন্দির ও ধর্মধামেই আমাকে সময় কাটাতে হয় বেশী। কেননা ওগুলোই হচ্ছে আমার প্রধান কর্মকেন্দ্র। তবে মফস্বলেও কিছু কিছু কাজ না করলে চলে না।

"আপনার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে যে, অহরহ মানুষের সহবাসে থাকা সত্ত্বেও তারা আমাকে দেখতে বা আমার অস্তিত্বই অনুভব করতে পারে না, এর কারণ কি এবং কোথায় বসে আমি মানুষকে দাগা দিয়ে থাকি? তা বলি শুনুন।

"আল্লাহ আমাকে ক্ষমতা দান করেছেন মানুষের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে এবং শিরায় শিরায় চলতে। যখন আমি কোনো ব্যক্তিকে দাগা দিতে চাই, তখন তাকে বাইরে থেকে ডেকে বলি না যে, তুমি এ কাজটি করো না এবং ও কাজটি করো। আমি তখন প্রবেশ করি তার দেহের কেন্দ্রস্থল মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিন্দু ত্রিতলা মনের একেবারে নীচের তলায়, যে জায়গাটির নাম 'অচেতন মন' বা 'নির্জ্ঞান মন'। সেখানে বসে আমি তার 'অচেতন মন'কে প্রলুব্ধ করি কোনো কাজ করতে বা না করতে। আমার কর্মকেন্দ্র মানুষের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে অবস্থিত। তাই দুষ্ট লোকেরা বলে 'টুপির নীচে শয়তান থাকে'। তাদের সে কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। কেননা আমার অধিষ্ঠানটি টুপির নীচেই, উপরে নয়।

"আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না, কেউ পারে না। আমি যা কিছু করি তদ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাকেই পূরণ করি এবং অন্যেরাও তা-ই করে থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে, বিশ্বাসীরা তা পুরাপুরি মানেন না। তাঁরা আল্লাহকে বলেন সর্বশক্তিমান, আবার কোনো কাজে আমার উপর দোষ চাপান। শুধু তাই নয়, তাঁরা আরও বলেন, 'শুভ কাজের কর্তা আল্লাহতা'লা এবং অশুভ কাজের কর্তা শয়তান।' যদি তা-ই হয়, তবে 'আল্লাহ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্বশক্তিমান'–এ কথাটির সার্থকতা কি? এতে কি আমাকে 'আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও দ্বিতীয় শক্তিধর' বলে প্রমাণিত হয় না? বস্তুত তা নয়। আমার সমস্ত কাজেই আছে আল্লাহতা'লার সমর্থন। এখন তাই একটু বলছি।

“বলা হয়, আল্লাহ দুনিয়ার সব কাজ করবার ক্ষমতাই মানুষকে দান করেছেন। কিন্তু হায়াত,মউত, রেজেক ও দৌলত, এ চারটি কাজ রেখেছেন নিজের হাতে। আবার এ কথাও বলা হয় যে, খুন-খারাবী, চুরি-ডাকাতি ও ব্যভিচারের উদ্যোক্তা শয়তান। তাই যদি হয় অর্থাৎ আমার দাগায় পড়েই যদি কোনো এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে আহত ব্যক্তির জান কবজ করতে আজরাইল ফেরেস্তা সেখানে আসেন কার হুকুমে? সেই দিনটি মৃতব্যক্তির হায়াতের শেষ দিন নয় কি? কলেরা-বসন্তাদি রোগে অসংখ্য মানুষ মরে জীবাণুদের আক্রমনে। সেই জীবাণুদের দাগা দেয় কে?

“সমস্ত জীবের রেজেক (খাদ্য) দান করেন স্বয়ং আল্লাহতা’লা। চোর-ডাকাতের রেজেক দান করেন কে? মানুষ জানে না যে, আল্লাহ কার রেজেক কার ভান্ডারে রেখেছেন। আল্লাহ যার রেজেক ও দৌলত যেখানে রেখেছেন, যে কোনও উপায়েই হোক সেখান থেকে এনে সে তা ভোগ করবেই। চোর চুরি করে বটে, কিন্তু আসলে সে তার আল্লাহর বরাদ্দকৃত খাদ্যই খায়। আমি যদি দাগা দিয়ে চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে একের রেজেক অন্যকে খাওয়াতে পারি, তাতে আল্লাহর গৌরব বাড়ে কি? অন্যান্য জীবের রেজেকও আল্লাহতা’লাই জোগান। গেরেস্ত বাড়ির হাঁস-মোরগ ও খাদ্যাদি চুরি করে শেয়াল-কুকুরে খায়। তাদের দাগা দেয় কে?

“বলা হয় যে, শয়তানের খপ্পরে পড়ে মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাতে আল্লাহর কোনো সমর্থন নেই। যদি তাই হয়, তবে জারজ সন্তানের প্রাণদান করে কে? মানব সৃষ্টোত্তর কালে আল্লাহ যখন মানুষের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে তিনি জানেন যে, কোন প্রাণ কখন কোথায় জন্মাবে, কে কি কাজ করবে এবং অন্তিমে কে কোথায় যাবে, অথাৎ বেহেস্তে না দোজকে। তিনি এ-ও জানতেন যে, কে কার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। তিনি ইচ্ছা করলে ব্যভিচারীদ্বয়কে দাম্পত্যবন্ধন দান করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে জারজ সন্তানদের জন্য প্রাণ সৃষ্টি করে রেখেছেন। জারজ সন্তানদের প্রাণদান করেন আল্লাহ ইচ্ছা করেই। ব্যভিচার ঘটিয়ে আমি আল্লাহর সেই ইচ্ছাকেই পূরণ করি মাত্র।

“বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, শয়তান না থাকলে মানবজাতির মঙ্গল হতো। তাঁরা ভেবে দেখেননি যে, আমার নির্দেশিত পথে চলে বর্তমান জগতের মানুষের যত আয়-উন্নতি এবং তারই সাহায্যে চলছে ভালো ধর্মের বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য। আজ যদি আমি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাই বা আমার দাগা কাজ বন্ধ করি, তাহলে মানবসমাজে যে বিপর্যয় দেখা দেবে তা থেকে রক্ষা পাবে না বিশ্ববাসীরাও।

“প্রথমত কতিপয় রাষ্ট্রীয় দপ্তর থাকবে না। ফলে মন্ত্রিত্ব হারাবে অনেকে এবং রাজ্যশাসনে বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ হবে কর্মহীন। সুরশিল্পী, চিত্রশিল্পী থাকবে না, থাকবে না মাদকদ্রব্যের ব্যবসা। এছাড়া থাকবে না সুদ, ঘুষ, কালোবাজারী ইত্যাদির পেশা। আর এতে মানবসমাজে যে ভয়াবহ বেকারত্ব ও আর্থিক সংকট দেখা দেবে, তার প্রতিক্রিয়া হবে ধর্মরাজ্যেও। কেননা ঐসব অসৎবৃত্তির আয় দ্বারাই তো হচ্ছে যতো মসজিদ-মাদ্রাসার ছড়াছড়ি ও হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি।

“কোনো কিছুর অভাব আমার নেই বা অন্য কোনো দুঃখ আমার নেই। একটিমাত্র দুঃখ এই যে, মানুষ আল্লাহকে না জানার ফলে এবং তার কুদরৎ অনুধাবন করতে না পেরে অযথা আমার উপর দোষারোপ করে। আল্লাহ ইচ্ছাময় ও মহান।

“এখন আর বেশী কথা বলার সময় নেই। নামাজের সময় হচ্ছে, মসজিদে যাই। আসসালামু আলাইকুম।” আগন্তুক চলে গেলেন মসজিদের দিকে। কিন্তু নামাজ পড়তে না দাগা দিতে তা বুঝা গেলো না। মাইকের আজানে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো, চেয়ে দেখি পূর্ব আকাশ পরিষ্কার। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে আমি ভাবতে লাগলাম- এতোদিন আমার মনে হচ্ছিল যে, হিন্দু পুরাণশাস্ত্রে লিখিত ‘নারদ মুনি’ই পরবর্তীকালে ‘শয়তান’ রূপ লাভ করেছে। উভয়ের পরিচয়পত্র মিলালে তা বেশ বুঝা যায়। হিন্দুশাস্ত্রমতে-‘নারদ’এর মাতাপিতা নেই। সে ভগবান ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি। তার বাসস্থান ছিলো স্বর্গে এবং সে ছিলো ধার্মিক চূড়ামণি। সে সৃষ্টিকর্তার একটি আদেশ অমান্য করায় অভিশপ্ত হয়ে (মানবরূপে) পতিত হয় মর্ত্যে (পৃথিবীতে)। সে ছিলো সর্ববিদ্যাবিশারদ এবং স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরীক্ষে ছিলো তার অবাধ গতি।’
সৃষ্টি, বাসস্থান, স্বর্গচ্যুতি ও গুণাবলীর বর্ণনায় ‘নারদ’ এবং ‘শয়তান’- এ দুজনের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। শয়তান যেনো নারদের একটি অভিনব সংস্করণ। তবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় নয়, চতুর্থ সংস্করণ। নারদ-নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণের নায়ক পার্সি ধর্মের ‘আহরিমান’, তৃতীয় সংস্করণে ইহুদী ধর্মের ‘সেদিম’ বা ‘দেয়াবল’ এবং চতুর্থ সংস্করণের নায়ক হচ্ছে শেষ জামানার ‘শয়তান’।

পূর্বেকার ঐসব ‘অনুমান' আমার হঠাৎ যেনো নস্যাৎ হয়ে গেলো। কেননা মূর্তিমান শয়তান যে আজ আমার চোখের সামনেই বসা ছিলো এতক্ষণ।

আরজ আলী মাতুব্বর